ভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরয। কিন্তু একে ভালবাসা নিন্দনীয়। কেননা, ভালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরয ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না বরং অপারক অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হিফাযত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ

آب آندر زیر کشتی پشتی آست آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এই পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনি-ভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ—অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেরই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফির মানুষ বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

سورة القارعة

সূরা কারেয়া

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ
هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (৬) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (অর্থাৎ কিয়ামত, যে অন্তরকে ভীতি এবং কানকে ভীষণ শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (কয়েকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক. সংখ্যাধিক্যের জন্য সেদিন বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই. দুর্বলতা ও শক্তি-হীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দু'টি কারণ হাশরের সব মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুষ অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, যা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মু'মিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উত্থিত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙীন পশমের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রূপ। যেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা যাবে। সেদিন মানুষের কর্ম ওজন করা হবে) অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে) এবং যার (ঈমানের) পাল্লা হালকা হবে (অর্থাৎ কাফির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিয়া) কি? (সেটা) এক প্রজ্বলিত অগ্নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারী ও কাফিরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাফির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে—গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামায, রোযা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

سورة التكاثر

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পার্থিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে; এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ বড়াই করার যোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, যাতে প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুষ দেখাকে এখানে দিব্য প্রত্যয়ে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর (আবার শুন) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ—تكاثر শব্দটি থেকে كثرة উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ্ (র) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।—(কুরতুবী)

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ—এখানে কবরস্থান যিয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌঁছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ حتى يأتيكم الموت—(ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আযাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট পৌঁছে দেখলাম, তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ তিলাওয়াত করে বলছিলেন ঃ

يقول ابن ادم مالى مالى لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت أو تصدقت فامضيت وفى رواية لمسلم وما سوى ذٰلك فذاهب وتاركه للناس -

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে—তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو كان لابن آدم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديان ولن يملاء فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب -

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন—(বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেনঃ আমরা সূরা তাকাছুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়—রসূলুল্লাহ্ (সা) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ—لو-এর জওয়াব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لما الهاكم التكاثر—উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ—উপরে বলা হয়েছে عين اليقين-এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মূসা (আ) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মূসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাযহারী)

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ—অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছেঃ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا—এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবেঃ আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি?—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিন-গুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্‌ম অনু-যায়ী সে কতটুকু আমল করেছে?—(বুখারী)

তফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র) বলেনঃ কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেনঃ এটা একান্ত যথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত ঃ রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরা-মকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে! তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।—(মাযহারী)

سورة العصر

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ; (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম যুগের (যাতে দুঃখ ও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগুলো বিনষ্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে (যা আত্মগুণ) এবং পরস্পরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয় সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকার গুণ। মোটকথা, যারা এ আত্মগুণ অর্জন করে এবং অপরকেও গুণান্বিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত ঃ হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হিসন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্য-জনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।—(ইবনে কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

তাদের ইহ্‌কাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেনঃ মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগ কালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন ঃ

حياتك انفاس تعد فكلما + مضى نفس منها انتقصت به جزءا

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুন্‌তি শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। যখন একটি শ্বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুষ্কালের অমূল্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাঁটি লাভ-দায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোন অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হল। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها —অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কোরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে ঃ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ----আয়ুষ্কাল যখন পুঁজি আর মানুষ হল ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা, এই বেচারীর পুঁজি কোন আড়ষ্ট পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আছরের যথার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তু চতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কালও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম---আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تواصى শব্দটি وصيت থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়্যত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়্যত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়্যতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে---এক. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিল মারূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নিহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সার-মর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী

করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র) বলেনঃ দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বভাবত বাধা দেয়---এক. সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ত্রুটি ঢুকে পড়লে কর্ম ত্রুটিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই. খেয়ালখুশী, যা মানুষকে কোন সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোন সময় মন্দকাজে লিপ্ত করে দেয়; যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশী ত্যাগ করে সৎ কাজ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া বোঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী ঃ এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহ্র অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন॥

سورة الهمزة

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣
كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ
الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨
فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহব্বত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহ্‌র অগ্নি, যা (আল্লাহ্‌র আদেশে) প্রজ্বলিত, (আল্লাহ্‌র অগ্নি; বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদয় পর্যন্ত

পৌঁছবে। সেই অগ্নি তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে (এভাবে যে, তারা অগ্নির) বড় লম্বা লম্বা স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত থাকবে; যেমন কাউকে অগ্নির সিন্দুকে পুরে দেওয়া হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ্ তিনটি হচ্ছে همز - لمز ও جمع مال প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে همز -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لمز -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

شرار عباد الله تعالى المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون لبراء العنت -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে---অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ---অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

سورة الفيل

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾
وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেন নি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি জানেন না যে, আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা। অতঃপর সেই ব্যবহার বর্ণিত হয়েছে)। তিনি কি তাদের (কাবা গৃহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার) চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? (এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করা)। তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সার-কথা এই যে, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর অবমাননা করে, তাদের এ ধরনের শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। দুনিয়াতেই শাস্তি এসে যেতে পারে; যেমন এসেছে হস্তীবাহিনীর উপর। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো অবধারিতই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল ঃ মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সা)-র জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।---(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এক প্রকার মো'জেযারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীস-বিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সা)-এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতি হত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঃ এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষ্য এরূপ ঃ আরবের ইয়ামেন প্রদেশ মুশরিক, 'হেমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খৃস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যু-নওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খৃস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহ্র ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খৃস্টানদের প্রতি রাজা যু-নওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খৃস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যু-নওয়াসের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়ামেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের কবল মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হল। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হল এবং আরবাত নিহত হল। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তথায় এমন একটি

বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়ামেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ্জ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করল ঃ এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হজ্জের জন্য কাবাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশী ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কাবার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহ্‌তান ও কোরায়েশ উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, জনৈক কোরায়শী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করল ঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরও আটটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হল। এতসব হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতী ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কাবাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতীর গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কাবাগৃহ (নাউযুবিল্লাহ্‌) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে গেল। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাসআম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ

করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবূ রেগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবূ রেগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কোরায়েশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দী করে নিয়ে এল। এতে রসূলে করীম (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কোরায়েশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কোরায়েশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কাবাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কোরায়েশদের কোন ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কোরায়েশ নেতা আবদুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে আবদুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ আমরাও আবরাহার মুকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মুকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহ্‌র ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের যিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ্ কি করেন। হানাতা বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আবদুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আবদুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। অবদুল মোত্তালিব বললেন ঃ আমার প্রয়োজন এত-টুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল ঃ আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না! আশ্চর্যের বিষয় বটে। আবদুল মোত্তালিব জওয়াব দিলেন ঃ উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল ঃ আপনার আল্লাহ্ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালিব বললেন ঃ তা'হলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, আবদুল মোত্তা-লিবের সাথে আরও কয়েকজন কোরায়েশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হল না। আবদুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি রায়তুল্লাহ্‌র চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কোরায়েশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হল। তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্, আবরাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। আপনিই আপনার ঘরের হিফাযতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হবে। প্রত্যুষে আবরাহা কাবা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমুদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দী নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল ঃ তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা, তুই এখন আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল। হাতী একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হল, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে দণ্ডায়মান হল না। তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হল, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহ্‌র কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখী সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলির প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেন ঃ পাখীগুলো অদ্ভুত ধরনের ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলি আবরাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পারে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আযাব দেখে সব হাতী ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতী ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হল। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পচে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়ামেনে নীত হল। রাজধানী 'সান'আয়' পৌঁছার পর তার সমস্ত শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহার হস্তী মাহমুদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি এই দু'জন

চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা)-র ভগিনী আসমা বলেন ঃ আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ — এখানে الم تر 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রা) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

أَبَابِيلَ—طَيْرًا أَبَابِيلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক---কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।---(কুরতুবী)

بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ----ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সেই কংকরকে سِجِّيل বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

عَصْف—فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ -এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরায়শদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।---(কুরতুবী)

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কোরায়েশরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কোরায়শে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

سورة القريش

সূরা কোরায়শ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا
الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কোরায়শের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোরায়শের আসক্তির কারণে, তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের আসক্তির কারণে। (এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ—আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حرف لام-এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لام-এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কোরায়শদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ তোমরা কোরায়শদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন ঃ এই لام-এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فليعبدوا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরায়শদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরায়শরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কোরায়শদের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ এ সূরায় আরও ইঙ্গিত আছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শগণ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ সব মানুষ কোরায়শের অনুগামী ভাল ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহ্‌র ওলীগণের অধিকাংশই কোরায়শের মধ্য থেকে হয়েছেন।—(মাযহারী)

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ—একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ-অর্থাৎ হে আল্লাহ্, এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের

রিযিক দান করুন। আরও বলেছিলেনঃ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ---অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রপিতামহ হাশিম কোরায়শকে ভিন্-দেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্ম-কালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহ্র খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কোরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ---নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কোরায়শকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ---সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরায়শকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ্ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশংকা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিয়ামত-সমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

আবুল হাসান কাযবিনী (র) বলেনঃ যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্য সূরা কোরায়শের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (র) বলেন---এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেনঃ আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক বালামুসিবত দূর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ্ (র) আরও বলেনঃ আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

سورة الماعون

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর; (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং ব্যবহার্য বস্তু দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। (আপনি তার অবস্থা শুনতে চাইলে শুনুন) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নিষ্ঠুর যে, নিজে দরিদ্রকে দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও একাজে উৎসাহিত করে না। বান্দার হক নষ্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন স্রষ্টার হক নষ্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়।) যারা (নামায পড়লেও) তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং যাকাত মোটেই দেয় না (যাকাত দেওয়ার জন্য সবার সামনে দেওয়া শরীয়ত মতে জরুরী নয়। কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু নামায জামা'আতের সাথে প্রকাশ্যে পড়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তা সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নেয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফিরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই ঃ ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখ বাস। সূরায় (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

---এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عن صلاتهم শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসূলে করীম (সা)ও মুক্ত ছিলেন না---তা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ--এর পরিবর্তে فِي صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ—ماعون শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও ماعون বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলির পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে ماعون বলে যাকাত

বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম---অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রা) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও যাহহাক (র) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীর-বিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।---(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে ماعون -এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই---এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরয যাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

سورة الكوثر

সূরা কাউসার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার (জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, তদুপরি সর্বপ্রকার কল্যাণও এর অর্থের মধ্যে শামিল)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব কল্যাণ অর্থাৎ ইহকালে ইসলামের স্থায়িত্ব ও উন্নতি এবং পরকালে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায পড়ুন (কেননা সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্ববৃহৎ ইবাদত দরকার আর [illegible] হচ্ছে নামায) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ তাঁর[illegible] নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামাযের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামাযের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্ভবত এই যে, কোরবানীর মধ্যে আর্থিক ইবাদতের সাথে সাথে মুশরিকদের ও মুশরিকসুলভ আচার-অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মুশরিকরা প্রতিমার নামে কোরবানী করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেমের শৈশবে ইন্তেকাল হলে কোন কোন মুশরিক দোষারোপ করেছিল যে, তাঁর বংশ বিস্তৃত হবে না এবং তাঁর ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র কৃপায় নির্বংশ নন, বরং] আপনার শত্রুরাই নির্বংশ, লেজকাটা। (ওদের বাহ্যিক বংশ বিস্তৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে ওদের শুভ আলোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহব্বত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভক্তি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত 'কাউসার' শব্দের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুত্র-সন্তানজাত বংশ না থাকুক কিন্তু বংশের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইহকালের পর পরকালেও অর্জিত রয়েছে। আপনার শত্রু এ থেকে বঞ্চিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে ابتر নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে দোষারোপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফির 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলত ঃ আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কোরায়শরা তার কাছে যেয়ে বলল ঃ আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহ্র হিফাযত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল ঃ আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।---(মাযহারী)

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্র-সন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যে আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ----হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম---কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একথাও ইবনে আব্বাস (রা) -এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই মুজাহিদ্ কাউসারের

তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাউযে কাউসার ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فى المسجد اذا اغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسما - قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت على انفا سورة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الخ ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربى عزو جل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة انيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فاقول رب انه من امتى فيقول انك لا تدرى ما احدث بعدك -

একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি-মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব ঃ পরওয়ারদিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।---(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة انه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وان انيته عدد نجوم السماء -

হাউয সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দুটি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দ্বারা হাউযকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দ্বারা সূরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউযে কাউসারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরও ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউসার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউযে কাউসার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনালার সাহায্যে এতে কাউসার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউযে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়---মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউযে কাউসার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্ হাদীসসমূহে হাউযে কাউসারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোন বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাউযে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তার আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ---نحر---শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর মজযুম পদ্ধতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে---নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্র নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে---

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ---আলোচ্য আয়াতে وَانْحَرْ---এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আতা,

মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নামাযে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাসীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ—شَانِئ-এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রসূলে করীম (সা)-এর স্মৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহ্র নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হল? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামী বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فاعتبروا يا اولى الابصار

سورة الكافرون

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ
اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ
دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফিরকুল, (২) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (কাফিরদেরকে) বলে দিন, হে কাফিরকুল (তোমাদের ও আমার তরীকা এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না---এখনও না এবং ভবিষ্যতেও না। পক্ষান্তরে তোমরা মুশরিক হয়ে একত্ববাদী সাব্যস্ত হতে পার না---এখনও না, ভবিষ্যতেও না। মানে একত্ববাদ ও শিরক হাত মিলাতে পারে না)। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে এবং আমি আমার প্রতিদান পাব। (এতে তাদের শিরকের কারণে শাস্তির খবর শুনানো হল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম---সূরা

কাফিরূন ও সূরা এখলাস।---(মাযহারী) তফসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেনঃ আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) বলেনঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেনঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হয়? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা) আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেনঃ কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা---সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেনঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। ---(মাযহারী)

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে বলঃ আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব।---(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন।---(মাযহারী)

আবূ সালেহ্-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মক্কার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফিরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্র অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে-নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জওয়াবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জওয়াবের মূল লক্ষ্য।

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ—এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তফসীরে لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ—আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল-কোরআনে এখানে دين অর্থ ধর্ম নয়---প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما-কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ—আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَآ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ---আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেনঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ---এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ---আরও এক আয়াতে

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ---এর সারমর্ম এই যে, ইবনে কাসীর دِيْن শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল-কোরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন---اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়-বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন।---(ইবনে কাসীর)

কাফিরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ ঃ আলোচ্য সূরায় কাফিরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্ক-ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, فَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا---অর্থাৎ কাফিররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও ইহুদীদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ আয়াতখানি কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। [illegible]এব অধিকাংশ তফসীর-বিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি [illegible]দ্ধ করার জন্য সূরা অবতীর্ণ

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে। فَإِنْ جَنَحُوا

আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেনঃ الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফিরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তি অন্বেষায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে---আল্লাহ্র আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দর কষাকষির অবকাশ নেই।

سورة النصر

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় (তার সমস্ত লক্ষণসহ) সমাগত হলো এবং (এ বিজয়ের ফলশ্রুতিগুলো হচ্ছে) আপনি লোকজনকে আল্লাহ্‌র দীনে (ইসলামে) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন (বুঝবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আখিরাতে যাত্রার সময় নিকটবর্তী, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার আকুতি ব্যক্ত করতে থাকুন। (অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো ব্যতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছা-কৃতভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থানা করুন)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবূলকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নছর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরারূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ সূরা নছর বিদায় হজ্জে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ—আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকী থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ—আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اِذَا جَاءَ ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ্ (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রা)-এর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এক সমাবেশে সূরাটি তিলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর (রা) একথা শুনে বললেন ঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।---(কুরতুবী)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ---মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরায়শদের ভয়ে অথবা কোন ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ্ ও ইস্তেগফার করা উচিত ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ---হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ---(বুখারী)

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ তিনি বলতেন ঃ আমাকে এরূপ আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়।---(কুরতুবী)

سورة اللهب

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও ..... যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ মানে আসল পুঁজি এবং উপার্জন মানে মুনাফা। উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও---যে ইন্ধন বহন করে আনে, [অর্থাৎ কণ্টকপূর্ণ ইন্ধন, যা সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পথে পুঁতে রাখত, যাতে তিনি কষ্ট পান। জাহান্নামে প্রবেশ করার পর] তার গলদেশে (জাহান্নামের শিকল ও বেড়ী হবে, যেন সেটা) হবে এক খর্জুরের রশি (শক্ত মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তুলনা করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত।---(ইবনে কাসীর)

শানে-নুযূল ঃ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরায়শ গোত্রের উদ্দেশে يا صباحاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হত)। ডাক শুনে কোরায়শ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি ? সবাই একবাক্যে বলে উঠল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল ঃ تبا لك الهذا جمعتنا ---ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ ? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয় ; যেমন কোরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল ঃ মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল ঃ এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল ঃ تبا لكما ماارى فيكما شيئا مما قال محمد ---অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও ; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تباب-এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تبت বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وتب-এ বদ-দোয়া

কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে تبا বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।---(বয়ানুল কোরআন)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ---তফসীরের সার-সংক্ষেপে ما كسب-এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه—অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।---(কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে مَا كَسَبَ-এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ঃ

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ---অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذات لهب বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ----আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حمالة الحطب বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حمالة (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حمالة الحطب -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন حمالة الحطب বলে ব্যক্ত করেছে।---(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত।--(ইবনে কাসীর)

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ ঃ রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেন ঃ তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোযাদারের রোযা এবং অযূওয়ালার অযূ নষ্ট করে দেয়---গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র) বলেন ঃ আমি হযরত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলাম ঃ لا يدخل الجنة ساف دم و لا مشاء بنميمة و لا تاجر يربى---অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশে করবে না---অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সূদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সূদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হল? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

مسد---فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ -শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু।

অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।---(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।---(মাযহারী)

শা'বী, মুকালিত (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেনঃ আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদাররূপে গণ্য হত। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝা এবং গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাযহারী) কিন্তু আবূ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছন্দ করেছেন।

سورة الاخلاص

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক, (২) আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আল্লাহ্‌ এ সূরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন)। আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণে) এক, (সত্তার গুণ এই যে, তিনি স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিফতের গুণ এই যে, তার জ্ঞান, কুদরত ইত্যাদি চিরন্তর ও সর্বব্যাপী)। আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং সবাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নুযূল ঃ তিরমিযী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।---(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল---আল্লাহ্‌ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফযীলত ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন ঃ এই সূরাটি কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান!---(মুসলিম, তিরমিযী) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়।---(ইবনে কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, কোরআন সব কিতাবেই নাযিল হয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়ো না, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।---(ইবনে কাসীর)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ---'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ্' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। واحد ও-احد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ---صمد শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد-এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যাঁর কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।---(ইবনে কাসীর)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ——যারা আল্লাহ্‌র বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য---স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ——অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে ঃ দুনিয়াতে তওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে ঃ সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিকসুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তওহীদের সবক দিয়েছে। তওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহ্‌র অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলীর পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব পূরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صَمَدٌ শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لَمْ يَلِدْ বলে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

سورة الفلق

সূরা ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণঃ ৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পলানকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া ও অপরকে তা শিক্ষা দওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাঁর উপর তাওয়াক্কুল তথা পুরোপুরি ভরসা করা ও ভরসা করার শিক্ষা দেওয়া। অতএব) আপনি (নিজে আশ্রয় চাওয়ার জন্য এবং অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ) বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, (বিশেষত) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, রাত্রিতে অনিষ্ট ও বিপদাপদের সম্ভাবনা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। [প্রথমে সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ বিশেষ বস্তুর উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ যাদু রাত্রিতেই সম্পন্ন করা হয়, যাতে কেউ জানতে না পারে এবং নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করা যায়। কবচে ফুঁৎকারদাত্রী মহিলার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর এভাবেই যাদু করা হয়েছিল, তা কোন পুরুষে করে থাকুক অথবা নারীরা نفاثات -এর বিশেষ্য نفوس ও হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল আছে এবং নারীও এর বিশেষ্য হতে পারে। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যে যাদু করেছিল, তার

কারণ ছিল হিংসা। এভাবে যাদু সম্পর্কিত সবকিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট অনিষ্ট ও বিপদাপদকে শামিল করার জন্য مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ——বলা হয়েছে।

আয়াতে আল্লাহ্‌কে প্রভাতের মালিক বলা হয়েছে অথচ আল্লাহ্ সকাল-বিকাল সবকিছুরই পলানকর্তা ও মালিক। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করে যেমন প্রভাতরশ্মি আনয়ন করেন, তেমনি তিনি যাদুরও বিলুপ্তি ঘটাতে পারেন]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম (র) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরা-দ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মসনদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদী যাদু করেছে এবং যে জিনিসে যাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলু-ল্লাহ্ (সা)-র উপর জনৈক ইহুদী যাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ আমার রোগটা কি আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল ঃ তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল ঃ ইনি যাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ কে যাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল ঃ কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সে কূপে গেলেন এবং বললেন ঃ স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান

থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর যাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, কতক সাহাবায়ে কিরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আরয করলেন ঃ আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তারে এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর-খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।---(ইবনে কাসীর)

যাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয় ঃ যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহ্র রসূলের উপর যাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে! যাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, যাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। যাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের যাদুগ্রস্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফযীলত ঃ প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ্ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এমন

আয়াত নাযিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা) ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।---(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম।---(ইবনে কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাবীব (রা) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন ঃ বল। আমি আরয করলাম, কি বলব? তিনি বললেন ঃ সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।---(মাযহারী)

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ—فلق-এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্র গুণ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্র সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন।---(মাযহারী)

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ---আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (র) লিখেন ঃ شر শব্দটি দু'প্রকার

বিষয়বস্তুকে শামিল করে--এক. প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যদ্দ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে ঃ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ—غسق শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান ও মুজাহিদ (র) غاسق-এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وقوب—এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই ঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ—نفث -এর অর্থ ফুঁ দেওয়া। عقد শব্দটি عقدة—এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা যাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نفوس -এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশী। এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ যাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ—অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর যাদু করা হয়েছিল। ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে যাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حسد শব্দের অর্থ কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তাঁর অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকাশে ইবলীস আদম (আ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে।---(কুরতুবী) حسد তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غبط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غاسق -এর সাথে اذا وقب এবং حاسد-এর সাথে اذا حسد সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نفاثات-এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, যাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় বরং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনিভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

سورة الناس

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۥ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মাবুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলুন, আমি মানুষের মালিক, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মাবুদের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার (অর্থাৎ সেই শয়তানের) অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও পশ্চাতে সরে যায়, (হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান সরে যায়। এখানে উদ্দেশ্য তাই)। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (অর্থাৎ আমি যেমন শয়তান জিন থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি, তেমনি শয়তান মানুষ থেকেও আশ্রয় গ্রহণ করছি। কোরআনের অন্যত্র আছে যে, মানুষ ও জিন উভয়ের মধ্য থেকে শয়তান হয়ে থাকে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য

সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ—এখানে ناس-এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فلق-এর দিকে رب-এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে رب শব্দের সম্বন্ধ ناس-এর দিকে করা হয়েছে।---(বায়যাভী)

مَلِكِ النَّاسِ---মানুষের অধিপতি, اِلٰهِ النَّاسِ---মানুষের মাবুদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رب শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়; যথা رب الدار গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই اِلٰهِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হিফাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হিফাযত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ্, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি---এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে رَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে مَلِكِهِمْ ও اِلٰهِهِمْ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ ناس শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেনঃ এ সূরায়

ناس শব্দ পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ناس বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে رب অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় ناس দ্বারা যুবক শ্রেণী বোঝানো হয়েছে। ملك (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় ناس বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ্ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ ناس বলে আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। وسوسة শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম ناس বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ---যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وسواس শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদ-মস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহবানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।---(কুরতুবী) خناس শব্দটি خنس থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহ্র যিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।---(মাযহারী)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ---অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ শয়তানও

কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (র) তদীয় গ্রন্থে বলেনঃ মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اللهم اعوذ بك من شر نفسى و من شر الشيطان و شركه—অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীমঃ ইবনে কাসীর বলেনঃ এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মাবুদ---আল্লাহ্ তা'আলার এই গুণত্রয় উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিদ্বান্ লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হলঃ হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রসূলুল্লাহ্ (সা) আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়্যা বিনতে-হুয়াই (রা) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সম্ভ্রমে আরয করলেনঃ সোবহানাল্লাহ্ ইয়া রসূলাল্লাহ্, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোন কুধারণা করব)। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ নিশ্চয়ই। কারণ, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশংকা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোন বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরী, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কু-ধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি

হয়---এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহ্‌র আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়।

এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়---সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোন গোনাহ্ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য ঃ সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র), তার মাত্র একটি বিশেষণ رب الفلق উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এথেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্বৃহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মুকাবিলা করার কোন বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদ্বয়ের আলাদা আলাদা প্রতিকার ঃ মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মুকাবিলা কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরোক্ত শত্রুদ্বয়ের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায় সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান-শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন ঃ সমগ্র কোরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ এর অর্থ

এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মুকাবিলা কর। এই আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

—وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

এতে শয়তান শত্রুর মুকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মুমিনুনে' প্রথমে মানুষ শত্রুর মুকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন ঃ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মুকাবিলার জন্য বলেছেন ঃ

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সিজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মুকাবিলার জন্য বলা হয়েছে ঃ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এটা প্রায় সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে, শয়তান শত্রুর মুকাবিলা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর যে নরপিশাচ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শক্তির মুকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মুকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় প্রযোজ্য---শয়তানের মুকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর যিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কোরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কোরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উভয় শত্রুর মুকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে ঃ উপরে কোরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর দ্বারা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মুকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মুকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সওয়াব ও শাহাদতের ফযীলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মুকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গোনাহ্ তার মুকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর ঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই বৃহৎ। তার মুকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا—নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা নহ্লে কোরআন পাঠ করার সময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ০

অর্থাৎ তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর

তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এজাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

تمت

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/১৪৮৪(উ)—৫২৫০